বিভক্তির সাতকাহন - ২৮

ভজন সরকার

মানুষের ওপর থেকে বিশ্বাস হারানো পাপ- এ বানী শুনে শুনে বিশ্বাস নামক জিনিসটা যে অতিশয় মহৎ সেটা যেমন মনে হবে । আবার এটাও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বিশ্বাসী না হওয়াও এক ধরনের অপরাধ । আসলেই তাই নাকি? আসলেই কি সব মানুষের ওপরেই বিশ্বাস রাখতে হবে ? নাকি বিশ্বাসের - পাত্র খুঁজতেই চলে যাবে জীবনের চরম ও পরম মূল্যবান সময়টুকু? আজকাল আবার বিশ্বাসের সাথে সাথে বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপারটা এতো বজ্র আটুঁনিতে আটকে গেছে যে, কাকে বিশ্বাস করে কী ক্ষতি হবে তার পূর্বাপর ভেবে ভেবে অনেকেই দশ হাত দূরে অবস্থান করেন অতিশয় সন্তর্পণে । আখেরে লাভের চেয়ে বর্তমান ক্ষতি থেকে রেহাই পেতেই মানুষের আকুতি বেশী । তাই বিশ্বাস নামক বস্তুটাই পালিয়ে গেছে হয়তো বা আজকাল । আর কাকেই বা বিশ্বাস করবেন আজ ?

অন্যত্র না ঘুরে নিজের জীবন থেকেই কূঁড়িয়ে নেয়া যাক না কিছু নূড়ি । দেখা যাবে, আমাদের শৈশব-যৌবন থেকে কিভাবে বিশ্বাস আর আদর্শটুকু দূরে যেতে যেতে কোথাও যেনো মিলিয়ে গেছে আজকাল । যাদের অনুসরণ করা যেতো নির্ভয়ে- নির্ভাবনায়- কখনো পেছনে হাঁটতে হাঁটতে নির্দ্বিধায় ধরা যেতো হাত-চলে যাওয়া যেতো দূরে আদর্শের কিংবা শান্তির কোন নিকেতনে । পরম আশ্চর্যে দেখা গেছে , মাঝ পথেই মানুষগুলো বাঁক ফিরিয়ে নিয়েছে অন্যপথে নিজের সুবিধে মতো । কেউ কেউ আবার হাঁটতে আরম্ভ করেছে এক শত আশি ডিগ্রিকোণে ঠিক পেছন দিকে।

আমরাই হয়তো হতভাগা যাদের বাল্যকাল,কৈশোর,শৈশব, যৌবন -প্রায় সবই কেটে গেছে আদর্শহীন এক উন্মাতাল সময়ে । অথচ আমাদেরই হবার কথা ছিলো স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের আদর্শ প্রজন্ম হিসেবেই । স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানী আর তাদের দোসরদের বর্ব রতা ঠিক অতখানি দাগ হয়তো কাটে নি আমাদের নিতান্তই বালক থাকার কারণে । কিন্তু স্মৃতির ঘুলঘুলি বেয়ে স্বাধীনতার যে উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে- একটি বালকের বেড়ে ওঠার জন্য তা ছিলো যথেষ্ট । এখন আর বাল্যশিক্ষার অবশিষ্ট নেই বাংলাদেশের কোথাও। হ্যা, আমি বাল্যশিক্ষা শিশুপাঠের কথাই বলছি । শহর থেকেই উঠে গেছে প্রথমে নিতান্তই সেঁকেলে,প্রাচীন আর সংস্কৃত তথা হিন্দু ঘেষা বা হিন্দুর পুঁথি বিবেচনা করেই । কোথাও কোথাও ইংরেজি আর সাহেবিআনার দাপটে। কোন কোন পরিবারে আভিজাত্যের ঠাট-ছাপ দেখানোর মানসিকতায় । আর গ্রাম থেকে উঠে গেছে খানিকটা হলেও পরে - আশির দশকের প্রথম ভাগে । নিয়মিত ডান-বাম করা শাসকের বুদ্বি যখন হাঁটু থেকে মাথায় পৌঁছেছে সে সময়ে । পঁচাত্তর থেকে প্রায় বছর দশেক তো লেগেই গেছে এ পর্যায়ে । আমরা তাই পঁচাত্তরের পরেও বাল্য শিক্ষা পড়েছি নিতান্তই গ্রামে থাকার সুফলে । বাল্যশিক্ষা কী পড়তেই হবে ? না, বাল্যশিক্ষা না পড়লেও চলে -তবে বাল্যকালের শিক্ষাটাতো থাকতে হবে ।

যাহোক, একদিন ভরা ভাদরে নৌকো করে স্কুলে যাচ্ছিলাম । এ বাড়ি-ও বাড়ি , এঘাট -ওঘাট করে যখন ছাত্র তোলা শেষ পর্যায়ে মাষ্টার মশাই বললেন, ‘‘ নৌকো ঘোরা ’’ । নৌকার হাল ধরে যে তাগড়া- জোয়ান উচু ক্লাসের ছাত্র নিরোদ— সে বৈঠা কাঁত করে নিমিষেই নৌকার দিক ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো । তখনো হয়তো বুঝি নে , নৌকোর দিকের সাথে সাথে একটি দেশের -একটি জাতির দিকও ঘুরে গেছে পূর্ব রাতেই শেখ মুজিবকে হত্যার সাথে সাথে ।

অথচ আমাদের তথা পরিবারের সে রকম কোন সুদিনই ছিলো না হয়তো স্বাধীনতার প্রথম কয়েকটি বছর । বাবা ছিলেন বাম-আদর্শ ঘেষা এক আদর্শ স্কুল শিক্ষক । এক ঝাঁক উজ্জ্বল সব বন্ধু নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন অদ্ভুত সব নেশায়- খেলাধূলো আর নাটক -থিয়েটার । আজকের মানিকগঞ্জের সে প্রত্যন্ত অঞ্চল তখন ঢাকা থেকে অনেক দূরে- দিল্লীর সমান । সপ্তাহ পার করে বাসায় আসতো মুজাফফর ন্যাপের মূখপাত্র ‘‘ নতুন বাংলা ’’ (ঠিক মনে পড়ছে তো ?) । দৈনিক সংবাদ আসতো অনেক বাড়ি ঘুরে- অনেক হাত বদলে । এখন তো নিজের কাছেই স্বপ্নের মতো মনে হয় অনেক কিছুই। হারিকেনের আলোতে গোল হয়ে কখনো পাড়ার অনেকে আর বৃষ্টির দিনে বাবা-মা দুজনে বিছানায় বসে পত্রিকা পড়ছেন । সংবাদের নিয়মিত কলাম ‘‘ দরবার-ই -জহুর’’ কিংবা নতুন বাংলার সেই শক্তিশালী ব্যঙ্গাত্মক রচনা ‘‘ খেদির মার কলাম ’’। আমরা তিন ভাই বোন বিছানায় বসে চিমটি কেঁটে কেঁটে ঘুমিয়ে গেছি হ্যারিকেনের আলো আধাঁরিতে মোটা মশারির নীচে ।

সে দিন বাড়ি ফিরে আসতেই দেখলাম বাবা বেশ গম্ভীর হয়ে রেডিও ঘোরাচ্ছেন । আকাশবানী কোলকাতাই তখন এক মাত্র বিকল্প । সেখান থেকেও নিশ্চিত হওয়া গেছে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে । ন্যাপ আর কমিউনিষ্টদের আধিপত্য আমাদের সমস্ত এলাকা জুড়ে । আর সেটাই চক্ষুশূল স্থানীয় শাসক দলের পাতি নেতাদের কাছে । রক্ষীবাহিনীর কাছে সত্য-মিথ্যে সংবাদ লাগিয়ে এ সমস্ত বাম ঘেষা মানুষদের নানা ভাবে অপদস্থ করাই ছিলো ওদের প্রধান কাজ । তাই শেখ মুজিবকে হত্যার পর মানুষের মনে যতটুকু স্বস্তি আসার কথা ছিলো -হলো তার ঠিক উলটো । স্থানীয় স্কুল আর কলেজ শিক্ষক -ছাত্রদের এক বিরাট শোক মিছিল বেড়িয়েছিলো সেদিন ঢাকা থেকে অনেক দূরে প্রত্যন্ত তেরশ্রীতে । সেদিনের মিছিলে শেখ মুজিবের নিজের সংগঠনের কোন নেতা -কর্মী ছিলো না । ছিলেন তারাই যাঁরা বুঝেছিলেন, শেখ মুজিব কে হত্যা করা মানে একটি ব্যক্তিকে নয় - একটি শেকঁড়কে উপড়ে ফেলা , একটি জাতিকে ঠেলে দেয়া অন্য পথে -অন্য দিক নির্দেশনায়। পরবতীর্তেও দেখেছি-সেটা নব্বই দশকের মাঝামাঝা পর্যন্তও-আমাদের স্কুলের অফিস-ঘরে প্রধান শিক্ষকের মাথার ওপর রবীন্দ্র-নজরুলের পাশে শেখ মুজিবের ছবি ঘর আলো করে টানানো আছে । আজো কী আছে সে ছবিগুলো ? যখন রবীন্দ্র-নজরুলকে বাটোয়ারা করে দেয়া হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের উত্তরাধিকারে । আর শেখ মুজিব - সেতো এখন সীমাবদ্ধ নিজের অনুসারী আর নিজ পরিবারের পরিধিতে!

আমাদের গ্রামের নিবারণ শিকদার স্বদেশী গান লিখে নিজেই সুর করে গাইতেন । একখানা বেহালা দেখেছি সব সময় বগলে করে ঘুরে বেড়াতেন । কবে কমরেড মুজাফফর আহমদ এসেছিলেন মানিকগঞ্জে, ডাক পড়েছিলো নিবারণ শিকদারের । নিজের লেখা গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন ভারতখ্যাত নেতা কমরেড মুজাফফরকে । এ স্মৃতি নিয়েই বেঁচে ছিলেন সারা জীবন । আদর্শের শেঁকড় মানূষকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখে জল-হাওয়া শুষে নিয়ে । আলোকিত করে - উজ্জীবিত করে ভালোর দিকে - আলোর দিকে । আমাদের স্বদেশী কবিয়াল নিবারণ শিকদার যেনো ছিলেন তারই প্রতিভূ । তার জীবনের শেষের দিকে আমাদের শৈশবে দেখেছি- কথা বোঝা যায় না , বেহালায় সুর -লয়-তাল কিচ্ছু নেই নিবারণ শিকদার আপন মনে গান গেয়ে যাচ্ছেন । কে জানে , এ হয়তো স্বদেশী কিংবা নিজের জীবনেরই কোন অতৃপ্ত চাওয়া-পাওয়ার বিহাগ ! কিংবা হয়তো বা নিজেরই কোন অবিশ্রান্ত আনন্দ-সংগীত এই জীবন-সায়াহ্নেও?

(চলবে)

।। মার্চ ২০০৭, কানাডা ।। sarekerbk@gmail.com